নবান্ন নাটকের ভূমিকা

বিজন ভট্টাচার্য

নাটকের পরিচয় সমকালীন যুগজীবনের সঙ্গে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত হলেও জনমানস - চেতনার একটা ধারাবিবর্তন আছে; আর সেই বিবর্তনের ইতিহাস ধরেই নাট্যসাহিত্যের সম্যক পরিচয় পরিস্ফুটিত।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যদশকে তদানীন্তক সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশে প্রথম যে নাট্য - আন্দোলনের গোড়াপত্তন হয়, তার স্ফুরণ ও সম্প্রসারণ ঘটে মুখ্যত সামন্ততান্ত্রিক ভাববিপ্লবের নাগরদোলায়। সুযুপ্তির পর একে ভাববাদী আধ্যাত্মিক মুক্তির পরিপূরক শক্তি হিসেবে কাব্য ও নাট্যসাহিত্যের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গির শর - সন্নিধান করে নিরঙ্কুশ বাববাদীর চোখে অব্যর্থ লক্ষ্যভেদ করেছেন, তবু ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদকে কেন্দ্র করে এই ভাববিপ্লব তখনও জাতির সামাজিক ও ব্যবহারিক জীবন নিয়ন্ত্রণ করেনি; জনমানস - চেতনায় নতুন করে আধ্যাত্মিক মুক্তির সন্ধান দিয়েছে মাত্র। প্রকৃতপক্ষে জাতির জীবনে এই মুক্তিমন্ত্রের প্রথম উদ্গাতা হলেন বঙ্কিমচন্দ্র। আধ্যাত্মিক মুক্তির দিক থেকে বঙ্কিমচন্দ্রই শ্রীমদভাগবদ্ গীতার শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রের সার্থক ভাষ্যকার।

অধ্যাত্মজগতে চিন্তার এই ভাববিপ্লব বৃহত্তর ভারতের সামাজিক জীবনে সেরকম কার্যকরী না হলেও বাংলাদেশে সেই ভাষ্যের প্রতিরূপ সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ও অধ্যাত্মজগতে বিবেকানন্দ প্রমুখ মনীষিগণের মধ্যে প্রতিভাত হয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের গৌড়ীয় শুদ্ধাভক্তি বা বৈষ্ণব ভাববাদী আদর্শের উত্তরাধিকারী নটগুরু গিরিশচন্দ্রের পর নাট্যের ক্ষেত্রে সেই বঙ্কিমী ভাষ্যের প্রতিরূপ দেখা যায় নাট্যচার্য শিশিরকুমারের মধ্যে। সাজানো বাগান শুকিয়ে যাবার অর্তির মধ্যে গৈরিশ যুগের যবনিকাপাত ঘটলেও স্বজাত্যভিমানী আলমগীর মঞ্চে আত্মপ্রকাশ করেন তার অনধিক এক যুগের মধ্যেই।

গিরিশচন্দ্র ও শিশিরকুমার — দুজনই রঙ্গমঞ্চে দুই যুগোত্তর প্রতিভা। এই দুই যুগন্ধর প্রতিভার মধ্যে মূলগত ঐক্য থাকলেও গুণগত পার্থক্য বহুলাংশে বিদ্যমান। এক জনের ভাব, অন্য জনের ভাবনা; এক জনের প্রেরণা, অন্য জনের দ্যোতনা। নাট্য - প্রযোজনার ক্ষেত্রে অবিনয়ের মাধ্যমে আবেগ - তরঙ্গের সৃষ্টি করাই ছিল গিরিশ - প্রতিভার বৈশিষ্ট্য। আর শিশিরকুমারের বিশিষ্টতা ছিল নাট্যের বিষয়বস্তু সম্পূর্ণ অধিগত করে অভিনয়ের মাধ্যমে সেই চরিত্রের বুদ্ধিদীপ্ত বিকিরণ। কি ক্লাসিক, কি ঐতিহাসিক, কি সামাজিক — শিশিরকুমারের প্রত্যেকটি প্রযোজনার ক্ষেত্রেই তাই ঐশী শক্তির জায়গায় মানুষী শক্তির বলিষ্ঠ প্রকাশ সুস্পষ্ট।

নাট্যাভিনয় ভিন্ন অন্যান্য শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রে স্বল্পাধিক কতগুলি রূপায়ণ - পদ্ধতি আছে। কিন্তু অভিনয় - শিল্পের রসবিচারে সে রকম কোনো নির্দিষ্ট নিরিখের মাধ্যমে নেই। ফলে অভিনয় - শিল্পের উৎকর্ষ অপকর্ষের বিচার শ্রোতার অন্তর্লীন মানসলোকের সূক্ষাতিসূক্ষ্ম স্বরগ্রাম ছুঁয়ে ছুঁয়ে কখনও বা সুগন্ধ পুষ্প - চন্দনের এক নিরবয়ব বিলসিত রূপরেখার লীলাবিলাসে, কখনও বা উৎকট কোনো বিকেন্দ্রিক চিত্তবিক্ষেপের ক্লান্তিকর অনুভবে ধরা পড়ে। অভিনয় - শিল্পের সেই বিচিত্র স্বরগ্রাম অদ্যাপিও প্রত্যক্ষভাবে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য না হলেও শিশিরকুমার -ই যে পরোক্ষভাবে তার সুর - লয় - মান কথঞ্চিৎ ভাবে সুনির্দিষ্ট করেন একথা সত্য। ইতিমধ্যে জীবন বদলেছে; পরিবর্তিত হয়েছে যুগের সামাজিক ও রাজনৈতিক চিন্তার পটভূমি। তাই রঙ্গমঞ্চে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের প্রতীক - চিহ্নিত প্রত্যেকটি রোমান্টিক হিরো, একদিন যারা ছিল সূর্যের মতো দীপ্যমান, হতম্লান হতে হতে চন্দ্রালোকের মত ম্রিয়মাণ, নিষ্প্রভ হয়ে গেল শিশিরকুমারের মধ্যেই। প্রসঙ্গত শ্রীরঙ্গম মঞ্চে 'নবান্ন' নাটকের অভিনয়ের কথা উল্লেখযোগ্য। ভাই বিশ্বনাথের কাঁধে হাত রেখে প্রধান সমাদ্দার তাঁকে কোন্ রজকের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল তা তিনিই জানেন। কিন্তু তাঁর ক্ষণিকের সেই বিভ্রান্তির মধ্যে আমি প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করেছিলাম, রামচন্দ্র যেন গুহক চণ্ডালরূপী এক রজকের ভূমিকায় পরোক্ষভাবে ধন্য হতে চাইছেন! শিল্পী হিসেবে সমন্বয়ও তিনি একটা দেখেছিলেন। এবং এই কারণেই শ্রীরঙ্গমে 'নবান্ন' নাটক মঞ্চস্থ হবার কয়ের বৎসর পরে তিনি তুলসী লাহিড়ীর 'দুঃখীর ইমান' প্রযোজনা করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় শিশিরকুমার সেই নাটকে অবতীর্ণ হন না। প্রজানুরঞ্জনে অভ্যস্ত অযোধ্যাপতি রামচন্দ্র কি দিল্লীশ্বর আলমগীরের পক্ষে সে দিন হয় তো প্রজাপুঞ্জের সঙ্গে একত্র পঙক্তি ভোজনে একটুখানি বেধেছিল। তারপর সূর্য গেল অস্তাচলে। আমাদের উত্তরাধিকারিত্বে রইল রাগরক্ত পশ্চিমাকাশ, যার পটভূমিতে নতুন করে নবনাট্যের উন্মোচন হল।

তখ্ৎ -ই-তাউস পরিত্যাগ করে প্রান্তরে সমাজের এক গুহক সৈনিকের দুর্মদ অঙ্গীকারের মধ্যেই নবনাট্যের নতুন দ্যোতনা। ভাববাদী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য থেকে বস্তুবাদী সমষ্টিচেতনায় নব উত্তরণের সেই বাল্যকাল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের গর্ভাঙ্কে সূচিত হল। সে আর এক যুগসন্ধিক্ষণ।

সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে সমগ্র এশিয়ায় যে গণ - অভ্যুত্থান দেখা দিয়েছে তাতে ভারতেরও মোহভঙ্গ হয়েছে। পূর্ণ স্বাধীনতা ভিন্ন আর কোনো শর্তই তার সম্পর্কে প্রযোজ্য নয়। জাগ্রত জনসাধারণের কড়া প্রহরায় উভয় পক্ষের উচ্চতন নেতৃবর্গের মধ্যে আপোসরফার ধারাটাও খানিকটা ছুরি - বাঘনখে পর্যবসিত। লক্ষকোটি জনগণমনে সরকার সম্পর্কে 'কুইট ইণ্ডিয়া'ই তখন একমাত্র স্লোগান। গান্ধীজীর সর্বশেষ 'মর কি বাঁচ' মন্ত্রই তখন প্রত্যেক ভারতীয়ের মনে একমাত্র গায়ত্রী। তাই ১৯৪২ সনের আগস্ট মাসে দেশব্যাপী যখন প্রত্যক্ষ গণ - অভ্যুত্থান আরম্ভ হল, ভারতবর্ষে ঔপনিবেশিক স্বার্থ বজায় রাখবার শেষ প্রাণান্তিক চেষ্টায় বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ তখন সমস্ত হিংস্রতা নিয়ে ভারতের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল। নিয়মতন্ত্রসম্মত ভাগ -বাঁটোয়ারার পর নীরক্তের স্বাধীনতা এল কালনেমির অভিশাপ মাথায় করে। তাই বিনা রক্ত পাতে অর্জিত স্বাধীনতার পাপক্ষালন হল আত্মঘাতী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার 'নবান্ন' নাটকের রচনাকাল এই রক্তক্ষয়ী ইতিহাসের প্রারম্ভিক পর্বে।

পবিত্র এই স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মবলিদান দিতে ভারতের লক্ষকোটি প্রাণ যেমন কাতার দিয়ে দাঁড়িয়েছে, তেমনি অন্যদিকে দেখতে পাই সাম্রাজ্যবাদীর পক্ষপুটছায়ায় পুষ্ট স্বার্থান্বেষী পাইকার মহাজন আর কালো - বাজারি মজুতদারের দল প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির সঙ্গে হাতে মিলিয়ে —দেশের লোকের রক্ত শুষে খাচ্ছে শরৎচন্দ্রের ভাষায় যে গরু গোমাংসের গাড়ি টানে এরা তাদেরি স্বধর্মী। শহীদ বেদীর ওপর দিয়ে সমাজদ্রোহী এই সব নর - পিশাচের শ্মশান - উল্লাস বাংলার বুকে সর্বনাশ ডেকে আনে এবং মাঠের রাজা কৃষক ভূমিহীন নিরন্ন ভিক্ষুকে পরিণত করে। কুৎসিত শাসন আর নিরঙ্কুশ শোষণের অনিবার্য ফলে বাংলা দেশের গ্রামীণ জীবন চূড়ান্তভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল। নেমে এল সারাদেশব্যাপী মহামন্বন্তরের করাল কালোছায়া। কুলোর বাতাস দিয়ে আগে আগে চললেন ধূমাবতী আর তার পশ্চাতে নিরন্ন মানুষেরা বিরামহীন। ভুখামিছিল শ্মশানের হাহাকার তুলে শহরের অলিগলি রাজপথ প্রদক্ষিণ করে ফিরতে লাগল। প্রাণের অপচয়ের সেই নিষ্করুণ ইতিবৃত্তান্ত সমগ্র জাতীয় জীবনে এক দুরপনেয় কলঙ্কের অধ্যায়।

দেশব্যাপী সেই অবিন্যস্ত ভয়ঙ্কর দিনে একদিকে যেমন অসহায় বুভুক্ষু মানুষ পথে প্রান্তরে কাতার দিয়ে মরছে, তেমনি চলেছে অন্যদিকে স্বাধীন ভারতের জীবনায়ন, —বহ্নিমান আগষ্ট আন্দোলনের দিনগুলোতে যে জীবন মৃত্যুহীন।

জাতীয় জীবনের এই আলো - আঁধারি সন্ধিক্ষণে প্রগতি লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ এক সাংস্কৃতিক আন্দোলন আরম্ভ করেন। পঠন - পাঠন ও জাতীয় সংগীতের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ছাড়াও নাটকের মাধ্যমে দেশের ও দশের কথা সাধারণ্যে প্রচার করবার উপযোগিতার বিষয় সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর কর্মীদের তখনই বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করে। বলা বাহুল্য আমিও সেই সঙ্ঘের একজন উদ্যোগী সভ্য হিসাবে সর্বপ্রথম 'আগুন' পরে 'জবানবন্দী' এবং তারপর 'নবান্ন' নাটক রচনা করি।

তদানীন্তন সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে 'আগুন' ছিল একটি পরীক্ষামূলক ক্ষুদ্র নাটিকা। স্বল্প কয়েকজন শিল্পীর সহযোগিতায় এই নাটিকাটি সহজেই কয়েকবার মঞ্চস্থ করা সম্ভব হয়। কিন্তু 'জবানবন্দী'র পরিবেশনকালে রীতিমতো রূপদক্ষ কতিপয় কুশলীর প্রয়োজন অনুভব করি। শিল্পী কুশলী হবেন নিঃসন্দেহে কিন্তু মঞ্চে 'অভিনয়কালে গতানুগতিক কৌশল করতে পারবেন না। পেশাদার মঞ্চের কলাকৌশল না দেখিয়ে শুধু পরান মণ্ডল, বেন্দা, পদা প্রমুখ চরিত্রের কুশলবার্তা মর্মে মর্মে অনুভব করে নিরন্ন মানুষের মুখে সোনাধানের নান্দীপাঠ করবেন। সহকর্মী গঙ্গাপদ বসুকে মরমী মানুষ বলে জানতাম। পরান মণ্ডলের ভূমিকা তাঁকেই মানাল ভালো। বেন্দা আর পদার ভূমিকায় অংশ গ্রহণ করলাম যথাক্রমে আমি আর সুধী প্রধান। এই সময়েই পূর্ব পরিচয়সূত্রে শম্ভু মিত্রকে সহকর্মী হিসাবে পাই। তিনি অভিনয় করেন রমজানের ভূমিকা। আত্মীয়তার সূত্রে তৃপ্তি ভাদুড়ী (পরে মিত্র) আসেন আমার সঙ্গে সঙ্গে। পরে 'নবান্ন' প্রয়োজনার সময় আরো কয়েকজন নব্য শিল্পীর শুভাগমন হয়। তাঁদের মধ্যে শ্রীমতী শোভা সেন ছিলেন অন্যতমা।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে ইতিমধ্যেই দুর্ভিক্ষ, মহামারী, আধিদৈবিক দুর্ঘটনা এবং দেশব্যাপী স্বাধীনতা আন্দোলনের গতি - প্রকৃতি পরিবর্তিত হয়ে চূড়ান্ত একটা পরিণতির দিকে নিষ্ঠুরভাবে অগ্রসর হয়েছে। প্রত্যেকটি সমস্যা এমন বিরাট আর ব্যাপক আকারে দেখা দিয়েছে যেমন মনে হচ্ছে অনর্থ যা কিছু ঘটছে তার উপর মানুষের যেন কোনো হাত নেই। সচেতন বুদ্ধিজীবী মনও তখনও সংশয় আর বিভ্রান্তির গোলকধাঁধায় ঘূর্ণায়মান। চরমতম এমনই সেই দুঃসময়ে 'জবানবন্দী'র ইঙ্গিতের সূত্রধার শহীদ মাতঙ্গিনী হাজরার দেশ মেদিনীপুর জেলার পটভূমিকায় প্রধান সমাদ্দরের নতুন জবানবন্দীতে 'নবান্ন' নাটক লিখতে বসলাম। মুমূর্ষু পরান মণ্ডলের চোখের সোনাধানের দুঃস্বপ্নই প্রধান সমাদ্দারের চোখে প্রতিভাত হয় জবাকুসুমসংকাশং রূপে। মৃত্যুকে বরণ করবার দুর্দমনীয় সংকল্প ঘোষণার মধ্য দিয়ে সে করে মৃত্যুকে অস্বীকার।

বহু চরিত্র - সমন্বিত এই নাটক একাদিক্রমে চার মাস মহলা দেবার পর মোটামুটি মঞ্চস্থ করবার মতো মনে হয়। এই সময় আমরা প্রায় দৈনিক সাত আট ঘন্টা করে মহলা দিতাম। চাষা নই তবু চাষার ভাষা আমার কথঞ্চিৎ আয়ত্ত ছিল। তাই বাচনভঙ্গি আর অভিনয়পদ্ধতি শিক্ষা দেবার দায়িত্ব আমাকেই গ্রহণ করতে হয়। প্রয়োগ-শিল্পের তত্ত্বাবধান করতে অনুরোধ করি শম্ভু মিত্রকে। পিতৃপ্রতিম মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য রঙ্গমঞ্চে চটের মাধ্যমে অভিনব দৃশ্যপট ব্যবহারের সার্থক পরামর্শ দেন!

পেশাদার মঞ্চের অসহযোগিতার কথা বলে লাভ নেই! তবে এই প্রসঙ্গে শ্রীরঙ্গমের বিশ্বনাথ ভাদুড়ীর বন্ধুবৎসল ব্যবহার স্বতই মনে পড়ে। পিপলস রিলিফ কমিটির উদ্যোগে প্রারম্ভিক পর্বে আমরা শ্রীরঙ্গ মঞ্চে 'নবান্ন' নাটক একাদিক্রমে সাত রাত্রি সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করি। ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের কর্মিবৃন্দের অক্লান্ত চেষ্টায় কলকাতার বিভিন্ন থিয়েটারে ও পার্কে এবং অবিভক্ত বাংলার বিভিন্ন জেলায় পরে আমরা 'নবান্ন' নাটক বহুবার পরিবেশন করি। সমবেত সাফল্যের কারণে স্বতই আমারও কিছু - কিঞ্চিৎ শ্লাঘা অনুভব করবার হেতু আছে।

আজ সুপ্রভাত। নিশান্তের দিন আকাঙ্ক্ষিত না হয়ে পারে না। কিন্তু কেউ কি নাগাল পেয়েছে দিনের! সামাজিক বৃহত্তর জীবনে প্রেতরূপী অবক্ষয়ের সেই কালোছায়া আজও আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনের ওপর আড় হয়ে পড়ে আছে। শিল্প আর শিল্পী দুজনেই বিভ্রান্ত। সে কারণে সাংস্কৃতিক সমন্বয় ও অন্বেষণের শত তাগিদ সত্ত্বেও আমরা সঠিক দৃষ্টিকোণ আজও খুঁজে পাচ্ছি না।

নিজের পিঠ নিজে যে চাপড়ায়, সে হয় বাতুল, নয় কানা। অথচ আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই গুরুবাদী দেশে অবস্থা ভেদে জ্ঞানাঞ্জন - শলাকার নিদান তত্ত্বগত সমাচার বিধায় আমরা রোজই একেকবার আবৃত্তি করি। কেন করি। এ প্রশ্নের উত্তরও আমাদের মুখে সমীচীন বোধ হয় না। কেননা যখন মন্ত্রোচ্চারণ করি আমরা তখনও কানা। আমাদের দিন রাত্রি নেই। কিন্তু এই প্রবচন অন্ধের অন্ধত্বের রক্ষাকবচ হলেও চক্ষুষ্মান মানুষের পক্ষে যে মৃত্যুবাণ সে সম্পর্কে সংশয়ান্বিত হবার হেতু নেই। নতুন মূল্যায়নের নাম ফাটকা পদ্ধতি কাণ্ডজ্ঞানের এই অপচয় বিশ্বের চোখে আমাদের প্রাণবস্তুর সোনার দাম চিরকালই কমিয়ে রাখবে। শিল্পসংস্কৃতি বিশেষ করে নাট্যের ক্ষেত্রে সত্যিকার সাফল্য সুদূরপরাহত হয়ে থাকবে অনাদ্যন্তকাল। শত শত রজনীর সগৌরব ঘোষণা নিরবচ্ছিন্ন এক ঘোর অমানিশার তমিস্রায় পর্যবসিত হবে।

সুতরাং সময় বিগত হলেও অবহিত হবার কারণ আছে। তাই সজ্ঞানে অজ্ঞানে থাকার কূটবুদ্ধি পরিহার করে কর্মপথে অগ্রসর হতে হবে। অজ্ঞানীকে জ্ঞানবান হতে হবে, জ্ঞানীকে হতে হবে প্রবুদ্ধ। বৃহত্তর সামাজিক জীবনের পটভূমিতে সাংস্কৃতিক জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে বাস্তব অবস্থার ঘাত - প্রতিঘাতে নিরন্তর যে নতুন নতুন সমস্যার উদ্ভব হচ্ছে, দিশি মতে ভাববিপ্লববাদের জারকরসে সেই বাস্তব সত্যগুলোকে জারিয়ে সাধকের পরিশুদ্ধি নিয়ে নির্দিষ্ট শিল্পের আঙ্গিক - সংগত রূপলেখাগুলোক টানতে হবে সতর্ক তুলিলিখনে। মনোবস্তুর সঙ্গে প্রাণ - বস্তুর এই সমন্বয় সাধন না করতে পারলে, আর যার হোক অন্তত আমার প্রতিমার চক্ষুদান করা এই পটুয়া - হাতে সম্ভব হবে না। আজ শিল্পীর চোখে যদি না এই প্রেম অপ্রেমের অনুভবী সত্য, যে সত্য কতকটা বাস্তব ও কতকটা ভাবনাশ্রিত, স্বপ্নসম্ভব, জ্ঞানবিজ্ঞানের সংক্রান্তিরেখায় নিরুপিত হয়, তাহলে শিল্পের ক্ষেত্রে দৃষ্টিকোণ পাওয়া যাবে না।

সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে একটা কথা আছে, কুকুরে মানুষ কামড়ালে খবরটা সংবাদ হয় না। মানষ যদি কুকুরকে কামড়ায় তবে সেটা চমৎকারিত্বের গুণে প্রকৃত সংবাদ হয়ে ওঠে। সংবাদ - সাহিত্যের এমন উদ্ভট রসবিচারের নিরিখে যদি নাটকের বিষয়বস্তু, অভিনয়ের আঙ্গিক ও প্রয়োগশিল্পের কলা - কৌশল নির্দিষ্ট হয় তাহলে নাটকের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সংশয়ান্বিত হবার অবকাশ অছে। চড়া রং আর কড়া লাইট-এ অন্তঃসারশূন্য দৃকপাতহীন প্রযোজনা নাট্যের দর্পণে জাতির অবক্ষয়িত প্রাণচৈতন্যের মর্মান্তিক প্রতিফলনই সাব্যস্ত করে।

অনুশোচনা অবান্তর। অঙ্গন - প্রাঙ্গণে নতুন নতুন নাটকের বলিষ্ঠ প্রযোজনা একমাত্র কথা। বর্তমান বাংলাদেশের ত্রিসহস্রাধিক নাট্য সংস্থার সমষ্টিগত প্রাণ চাঞ্চল্য সেই অনাগত ভবিষ্যতের শুভ সূচনামাত্র। দুঃখের বিষয় নাটককে পরিবেশন করতে গিয়ে শত বাধাবিপত্তির মধ্যে বিয়াল্লিশের কালেও যে উন্মুখ প্রাণের পরিসর পেতাম, বর্তমান অবস্থায় আবাধ সুযোগ - সুবিধার মধ্যে আজ সেই উৎসব - অঙ্গনের সন্ধান পাই না। আমিই অঙ্গন চিনি না, না অঙ্গনই আমাকে চেনে না কে জানে!

ভূমিকা দীর্ঘায়িত করে লাভ নেই। তবে দায় ও দায়িত্ব স্বীকার করি বলেই মোটামুটি ভাবে যা সমীচীন মনে হয়েছে, অকপটভাবে উত্থাপন করেছি। বাহুল্য যদি কিছু থেকে থাকে তাকে পাঠক সাধারণ ক্ষমা করবেন।

পরিশেষে সুনীল দত্তকে ধন্যবাদ জানাই। তাঁর উদ্যোগ ভিন্ন নবান্ন নাটকের এই সংস্করণ কখনই ছাপা সম্ভব হত না।

নবান্ন নাটকের চরিত্রলিপি
প্রযোজনা — ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘ

প্রধান সমাদ্দার	(আনিপুরের বৃদ্ধ চাষী)	বিজন ভট্টাচার্য
কুঞ্জ সমাদ্দার	(প্রধানের ভাইপো)	সুধী প্রদান
নিরঞ্জন সমাদ্দার	(কুঞ্জর সহোদর)	জলদ চট্টোপাধ্যায়
মাখন	(কুঞ্জর ছেলে)	মণিকা ভট্টাচার্য (চক্রবর্তী)
দয়াল মণ্ডল	(প্রতিবেশী)	শম্ভু মিত্র
হারু দত্ত	(স্থানীয় পোদ্দার)	গঙ্গাপদ বসু
কালীধন ধাড়া	(চাল ব্যবসায়ী)	চারুপ্রকাশ ঘোষ
রাজীব	(কালীধনের সরকার)	সজল রায়চৌধুরী
চন্দর	(জনৈক চাষী)	রঞ্জিৎ বসু
যুধিষ্ঠির	(আন্দোলনকারী)	নীহার দাশগুপ্ত
		অমল ভট্টাচার্য
ফটোগ্রাফারদ্বয়	(সংবাদপত্রের প্রতিনিধি)	রবীন মজুমদার
প্রথম ভদ্রলোক	(চাল খরিদ্দার)	মনোরঞ্জন বড়াল
বরকর্তা	(বড়কর্তা)	চিত্ত হোড়
বৃদ্ধ ভিখারি	—	গোপাল হালদার
ডোম	—	শম্ভু হালদার
দারোগা	—	বিমলেন্দু ঘোষ
ডাক্তার	—	সমর রায়চৌধুরী
দিগম্বর	—	অজিত মিত্র
ফকির	—	সত্যজীবন ভট্টাচার্য
পঞ্চাননী	(প্রধানের স্ত্রী)	মণিকুন্তলা সেন
রাধিকা	(কুঞ্জর স্ত্রী)	শোভা সেন
বিনোদিনী	(নিরঞ্জনের স্ত্রী)	তৃপ্তি ভাদুড়ী (মিত্র)
খুকির মা		কল্যাণী কুমারমঙ্গলম
ভিখারিনী		বিভা সেন
বাংলার ম্যাডোনা		ললিতা বিশ্বাস

ভদ্রলোক, নির্মলবাবু, টাউট, ভিখারি, হারু দত্তর শালা, কনস্টেবল, রোগী, ভৃত্য, চন্দরের মেয়ে, বরকত, কৃষক, নিরন্নের দল, জনতা ইত্যাদি ইত্যাদি।

পরিচালন	:	শম্ভু মিত্র ও বিজন ভট্টাচার্য।
উপদেষ্টা	:	মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য
আবহ সংগীত পরিচালক	:	গৌর ঘোষ।
সহযোগিতা করেছেন	:	সুজিত নাথ, অর্ধেন্দু ঘোষ, বিজয় দে, ক্ষীরোদ গাঙ্গুলী, শৈলেন দাস, চণ্ডী ঘোষ, কমল মিত্র, সুশীল বিশ্বাস, বরদা সেনগুপ্ত, সুনীল গুপ্ত, শান্তি মিত্র, ননীগোপাল চৌধুরী, লক্ষ্মণ দাশ।
মঞ্চাধ্যক্ষ	:	চিত্ত ব্যানার্জি।
সহযোগী	:	অরুণ দাশগুপ্ত

সূত্র - প্রমা